চিংড়ি রফতানিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নাইট্রোফুরান

■ মমিন উদ দৌলা

খবরটি বাংলাদেশের জন্য খুবই খারাপ। রফতানি করা চিংড়ি নাইট্রোফুরান ব্যবহার করার কারণে ফেরত এসেছে। আগামীতে চিংড়ি রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। সাসপেন্ড করা হয়েছে কয়েকটি অত্যাধুনিক প্রসেসিং প্লান্টকে। অথচ নাইট্রোফুরানের সাথে এদের কোনো সম্পর্কই নেই। জানা যায়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় নাইট্রোফুরানের উপস্থিতির সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করেছে বছরখানেক আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে চিংড়ি রফতানির মতো এত গুরুত্বপূর্ণ খাতকে রক্ষার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

যে জিনিসের জন্য চিংড়ি রফতানির ওপর এই বিধিনিষেধ সেই নাইট্রোফুরান কী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে তার অবস্থান কোথায় সেটা জানা দরকার।

নাইট্রোফুরান এন্টিবায়োটিক হিসেবে ব্যবহৃত [illegible] ওষুধ যার আণবিক গঠনে রয়েছে নাইট্রো গ্রুপের সাথে একটি ফুরান রিং। একই ধরনের ওষুধের মধ্যে আছে– ফুরাজলিডন, নাইট্রোফুরানটইন, নাইট্রোফুরাজোন, নিফুরটইনল, নিফুরক্সাজাইড, নিফুরটিমক্স ও নিফুরজাইড। এই সব রাসায়নিক পদার্থে ক্ষতিকর ও বেশি মাত্রায় অবশেষ থাকায় অনেক দেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিশেষ করে যেসব দেশ প্রাণিজপণ্য যেমন– চিংড়ি, মাছ, মুরগি, গোশত, ডিম, দুধ ইত্যাদি উন্নত দেশে রফতানি করে সেসব দেশে এটা ব্যবহার নিষিদ্ধ। নাইট্রোফুরানকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল রেগুলেশন ২৩৭৭/৯০-এর ANNEX IV শ্রেণীভুক্ত করার মাধ্যমে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত প্রাণীতে ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ১৯৮৫ সাল থেকে ফোরালটাডোন নিষিদ্ধ করেছে। ১৯৯২ সালে অন্যান্য নাইট্রোফুরান ড্রাগের অনুমোদন প্রত্যাহার করেছে। ফুরাজলিডন ও নাইট্রোফুরাজন নিষিদ্ধ করা হয় ২০০২ সালে। অস্ট্রেলিয়া এটার ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ১৯৯২ সালে। জাপানে জিরো টলারেন্স বা নো রেসিডিউ স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগে এমআরএল-এ নাইট্রোফুরান অন্তর্ভুক্ত করেনি। থাইল্যান্ডে ২০০১ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা খাদ্যে প্রয়োগ করা প্রজ্ঞাপনে একে এমআরএল-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালে পশুখাদ্যে ফুরাজলিডন ও নাইট্রোফুরাজন ব্যবহার ও আমদানি নিষিদ্ধ করে যা ২০০২ সালে সব ধরনের নাইট্রোফুরানের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়। নাইট্রোফুরানের বেশ কিছু মেটাবোলাইটস্ যেমন- ফুরাজলিডন, ফুরাল্টাডোন ও নাইট্রোফুরাজোন ইঁদুরে ক্যান্সার হয়, বংশগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেয়।

সরকারের পদক্ষেপ : ক্রেতা বা বিদেশী রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক বছর আগে হিমায়িত খাদ্যে এই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় একটি উদ্যোগ নিয়েছিল যেখানে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল লোকবল, প্রাইভেটসেক্টর সহায়ক প্রতিষ্ঠান যেমন- হ্যাচারি, ফিডমিল, এনিম্যাল হেলথ কোম্পানিসহ এই সম্পর্কিত স্টোক হোল্ডার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে নাইট্রোফুরানের উৎস সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয় যা নিম্নরূপ-

হ্যাচারি : অনেক হ্যাচারিতে ব্রুড স্টকের চিকিৎসার জন্য নাইট্রোফুরান ব্যবহার করা হচ্ছে। এখান থেকে নাইট্রোফুরান রেসিডিউ হিসেবে রেণু পোনা ও চাষ পুকুরে চলে যায়।

খাদ্য উৎস : চিংড়ি চাষে তৈরি খাদ্য প্রয়োগ করতে হয় যেখানে মাছের বৃদ্ধির জন্য উচ্চ প্রোটিন রাখা প্রয়োজন। এই প্রোটিনের অন্যতম উৎস মিট অ্যান্ড বোন মিল যা অতি নিম্নমানের, পরিবর্তনশীল

এবং সুনির্দিষ্ট মানসম্পন্ন নয়। অথচ এটা বৈধ পথে আমদানি করা হচ্ছে। এই পণ্যটি প্রকৃত অর্থে প্রাণিজখাদ্যে ব্যবহারের উপযোগী কিংবা উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি, বরং জৈব সার হিসেবে ও শীত প্রধান দেশে ফায়ার প্লেসে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়। মিট অ্যান্ড বোন মিলে শুধু নাইট্রোফুরান নয়, এতে রয়েছে শুকরের মাংস বা এর বাইপ্রোডাক্ট যা ধর্মীয় কারণে আমাদের দেশে আমদানি নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও পণ্যটি আমাদের দেশে পোলট্রি ও মৎস্য খাদ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দেশীয় শুঁটকি মাছ : মৎস্যচাষি এবং খাদ্য প্রস্তুতকারীরা আমিষ হিসেবে শুঁটকি মাছ খাদ্যে ব্যবহার করে থাকেন। শুঁটকি মাছকে সংরক্ষণ ও ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখার জন্য সাধারণত নাইট্রোফুরান ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য কীটনাশকের ব্যবহারও হয়। প্রাণীর প্রাণিজখাদ্যে এ জাতীয় কাঁচামালের ব্যবহার প্রাণীর জন্য তো বটেই জনস্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

জৈব সার : চিংড়ি ও মাছের পুকুরে প্লাঙ্কটন বাড়ানোর জন্য এবং খাদ্য হিসেবে প্রায়ই গোবর ও পোলট্রি বিষ্ঠা ব্যবহার করা হয়। এই সব গোবর ও বিষ্ঠায় রয়েছে ক্ষতিকর নাইট্রোফুরান। কারণ আমাদের দেশের পোলট্রি ও গবাদিপশুকে নাইট্রোফুরান জাতীয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় যা বিষ্ঠার মাধ্যমে মাছের পুকুরে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

জরুরি ভিত্তিতে যা করা উচিত

নাইট্রোফুরানের গুরুত্ব সম্পর্কে হ্যাচারি, মাছ চাষি, খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী, সম্প্রসারণ বিভাগ, স্থানীয় ফিসমিল সরবরাহকারী ও হিমায়িত খাদ্য রফতানীকারকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সম্ভাব্য সকল উৎসে এটার উপস্থিতি নির্ণয়ে পরীক্ষাগার স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাইট্রোফুরানের উপস্থিতির প্রাথমিক পরীক্ষা করার উপযোগী টেস্ট কিট সরবরাহ করা।

সম্ভাব্য সকল উৎসে নাইট্রোফুরানের উপস্থিতি মনিটরিং করার জন্য সেল ও তদারকি টিম গঠন করতে হবে। বর্তমানে যে মিট অ্যান্ড বোন মিল ব্যবহার করা হচ্ছে, জনস্বাস্থ্য ও চিংড়ি শিল্পকে সুরক্ষায় তার আমদানি বন্ধ করতে হবে। নাইট্রোফুরান গ্রুপের আওতায় বিদ্যমান সব ওষুধের প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা মুল্যায়ন করে এগুলোর উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধ করতে হবে।

পরিশেষ : নাইট্রোফুরান সমস্যার সমাধান কঠিন কিছু নয়। যদি সরকার কিছু শিল্প যেমন ফিড মিল, ফার্মাসিউটিক্যালস্ এবং আমদানীকারক যারা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এসব প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত না হয়।